হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

Vol. No. 2, Issue No. 4, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 1.00, June 2012

"পৃথিবীতে দুই সম্প্রদায় আছে অন্য সমস্ত ধর্মমতের সঙ্গে যাদের বিরুদ্ধতা অত্যুগ্র – সে হচ্ছে খ্রীষ্টান আর মুসলমান ধর্ম। তারা নিজের ধর্মকে পালন করে সন্তুষ্ট নয়, অন্য ধর্মকে সংহার করতে উদ্যত। এইজন্য তাদের ধর্মগ্রহণ করা ছাড়া তাদের সঙ্গে মিলবার কোন উপায় নেই।"
-- **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,** রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ত্রয়োদশ খন্ড, পৃঃ ৩৫৬।

দঃ ২৪ পরগণা জেলা কাশ্মীরের পরিনতির দিকে এগিয়ে চলেছে

তারানগর রূপনগরে হিন্দু পলায়ন শুরু হয়েছে

তারানগর ও রূপনগরে মুসলমান দুস্কৃতিদের তাণ্ডবে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যাওয়া বাড়ির সামনে অসহায় পরিবার।

গ্রামের নাম তারানগর ও রূপনগর। থানা - জয়নগর, জেলা – দঃ ২৪ পরগণা। গত ১৪ই মে এখানে যে ঘটনা ঘটে গেল পৃথিবী তা জানতে পারল না। কিন্তু এই দুটি গ্রামের মানুষের জীবনকে আমূল পরিবর্তন করে দিল। বেলা ১১টা থেকে শুরু হয়েছিল তান্ডব। পাশের খান পাড়ার মুসলমানরা ছিল সক্রিয় ভুমিকায়। অন্যান্য জায়গা থেকে আগত প্রায় দুহাজার (২০০০) মুসলমান এলাকাটাকে ঘিরে রেখেছিল। হাতে ছিল বোতল ও জারিকেন ভরে আনা পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন। একের পর এক বাড়িতে চড়াও হয়ে পেট্রোল ছড়িয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এই হিন্দু গ্রামগুলিতে তখন পুরুষ মানুষ কম ছিল, তারা অনেকেই কাজের জন্য বাইরে। তবুও যারা ছিল এবং মহিলারা – তারা যখন বাধা দিতে গেল, তাদের উপর পড়ল প্রচন্ড মার। বন্দুকের বাঁট, লোহার রড, লাঠি দিয়ে। মেয়েরাও বাদ গেল না। মুসলিম জনতা দ্বারা লুট হতে লাগল একের পর এক বাড়ি, বাড়ির সোনাদানা, টাকা, দামি কাপড়জামা, বাসনপত্র, ধান চাল সব। লুটের পর দেওয়া হল আগুন। অনেক বাড়িতেই আলাদা করে থাকে রান্নাঘর ও গোয়ালঘর। আর থাকে ধানের গোলা। এগুলিকেও আলাদা করে পোড়ানো হল। তুলে নিয়ে গেল গোয়ালঘর থেকে গরু, বাছুর। আর ধানের গোলা যেন তাদের বিশেষ আক্রোশের বস্তু। ধানের উপর ডিজেল ঢেলে আগুন দেওয়া হল।

আর একটি বিশেষ ঘটনা ঘটল। ফাঁড়ির পুলিশের সামনে থেকেই তুলে নিয়ে যাওয়া হল দুই হিন্দু গৃহবধূকে। বাধা দেওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করেও তারা আত্মরক্ষা করতে পারল না। তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হল খান পাড়ায় সওকত খানের বাড়ির ছাদে। তাদের দুই হাত ও দুই পা লোহার শিকল দিয়ে বাঁধা হল। এবং কয়েক ঘন্টা ধরে তাদের উপর চলতে থাকল প্রচন্ড অত্যাচার। এদের মধ্যে একজনের স্বামী অনিল হালদার পরে জানিয়েছেন যে, এই দুই গৃহবধূকেই টাঙ্গির উল্টো দিক দিয়ে প্রচন্ড মারা হয়েছে। তাদের সারা শরীরে কালো দাগ পড়ে গিয়েছে যা এক সপ্তাহ পরেও মুছে যায়নি। এছাড়া ষোলো বছরের টুম্পা নস্করকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল দুর্বৃত্তেরা। অন্য মহিলারা কোনোরকমে তার প্রাণ বাঁচায়। বিকালবেলায় যখন র‍্যাফ আসলো ততক্ষণে তারানগর ও রূপনগরের তেতাল্লিশটা বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। তারানগর গ্রামের নস্কর পাড়ার সাতটি বাড়ি, হালদার পাড়ার ষোলোটি বাড়ি, কয়াল পাড়ার তিনটি বাড়ি, ঘরামি পাড়ার দুটি বাড়ি, সরদার পাড়ার চারটি বাড়ি, রূপনগরের হালদার পাড়ার একুশটি বাড়ি – মোট তিপ্পান্নটি বাড়ি পোড়ানো

শেষাংশ ২ পাতায়

বজবজে গাছ কাটাকে ঘিরে হিন্দু প্রতিরোধ

বজবজ থানার অন্তর্গত জামালপুর, ব্রাহ্মণপাড়া, নিশ্চিন্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। এই অঞ্চলে একটি পুকুরের সম্প্রসারণের ফলে ২০০৯ সালে সরকার থেকে তাকে ঘিরে দেওয়া হয়। ফলে গাড়ি চলাচলের রাস্তা ছোট হয়ে যায়। ঐ রাস্তার ওপারেই প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন একটা গাছ আছে। ওই গাছের তলায় বাঁধানো বেদিতে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ। হিন্দুরা ওখানে নিয়মিত পুজো দেয়। পুকুরের দিকের জলাজমি বুজিয়ে হিন্দুরা রাস্তা সম্প্রসারণ করতে গেলে মুসলিমরা বাধা দেয়। তাদের বক্তব্য রাস্তার ওপারের গাছ কেটে রাস্তা সম্প্রসারণ করতে হবে। একথা স্রেফ তারা হিন্দুদের ধর্মে আঘাত করার জন্য বলে। কারণ ওই গাছ ও তার সংলগ্ন বেদি হিন্দুদের কাছে পবিত্র এবং তারা ওখানে পূজাআর্চা করে। হিন্দুদের পুজো বন্ধ করাই তাদের লক্ষ্য। ওই অঞ্চলের ফারাত হোসেন, শেখ আব্দুল সালাম, সইফুল ইসলাম খান, আনোয়ার আলি মল্লিক, জয়নাল আবেদিনসহ একশো মুসলিম গাছ কাটার দাবি করে। ঐ পাড়ার হিন্দুরাও এর প্রতিরোধে এগিয়ে আসে। শক্তিপদ সাহু, পরিতোষ প্রামাণিক, শ্যামল ঢালি, অমলেশ প্রামাণিক, দেবু মণ্ডল সহ ২৪১ গ্রামবাসীর স্বাক্ষরিত প্রতিবাদপত্র বি. ডি. ও., এস. ডি. ও., ডি. এম., এস. পি., আই. জি. এবং চিফ সেক্রেটারির কাছে পাঠানো হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় যথেষ্ট উত্তেজনা রয়েছে। হিন্দুরা সর্বশক্তি দিয়ে এই গাছ কাটাকে প্রতিরোধ করতে বদ্ধ পরিকর। বিষয়টি প্রশাসনিক স্তরে বিচারাধীন রয়েছে।

গাজীখালিতে মসজিদ আটকানো গেলো

গ্রাম – গাজীখালি, থানা – সন্দেশখালি,জেলা – উঃ ২৪ পরগণা।

এই গ্রামে ২০০ ঘর হিন্দুর বাস ও ১০ ঘর মুসলিমের বাস। গ্রামে কোনো মসজিদ নেই। তাই মুসলিমরা নিজের বাড়িতেই নামাজ পড়ে। ওদের বড় পরবে সরবেড়িয়ার বড় মসজিদ অথবা অন্য কোনো গ্রামের মসজিদে তারা যায় নামাজ পড়তে। এদিকে পরিবর্তন হয়েছে, তাই গ্রামের বাইরে থেকে জনৈক বড় মিঞা (শাঁকদা) ও জুলফিকার এসে এই গ্রামে মুসলমানদের গায়ে পরিবর্তনের হাওয়া লাগানোর চেষ্টা করলো। বড় মিঞা ও জুলফিকার বহিরাগত এবং তারা সি.পি.এম আশ্রিত। বড় মিঞা ও জুলফিকারদের উস্কানিতে গাজীখালির মুসলিমরা গ্রামের ৬ কাঠার একটি খাস জমি দখল করে মসজিদ তৈরীর চেষ্টা শুরু করেছিল। ওখানে প্রায় তিন বিঘে খাস জমি আছে। তার মধ্যে ছয় কাঠার উপরে ঘর তৈরীর জন্য মাটি ফেলা শুরু করল। গ্রামের হিন্দুরা প্রচন্ড শঙ্কিত হয়ে পড়ল। কারণ কাছেই দুটি হিন্দু মন্দির আছে। একটি পুরাতন কালী-শীতলা মন্দির ও একটি নূতন রাধাকৃষ্ণ মন্দির। এছাড়াও ঐ প্রস্তাবিত মসজিদটি রাস্তার পাশে হওয়ায় হিন্দুরা তাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে জানে যে এরপর এই রাস্তা দিয়ে হরিধ্বনি দিয়ে হিন্দুদের শবযাত্রা নিয়ে যেতে বাধা পড়বে। নমাজের সময় মন্দিরের পূজা ও ঘন্টাধ্বনিতে বাধা পড়বে। তাই হিন্দুরা একজোট হয়ে বাধা দিল। তারা গণস্বাক্ষর করে থানায় দরখাস্ত জমা দিল। থানার অফিসার প্রথমে হিন্দুদের ওপরেই চোটপাট করতে লাগল। অফিসারের কথা – ভারত ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। এখানে মুসলমানরা ধর্ম পালন করবে না? হিন্দুরা উত্তর দিল – নিশ্চই করবে। এতদিন যেমন করে করেছে তেমনি করে করবে। কিন্তু পুলিশ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না জানিয়ে দিল। তখন গ্রামবাসীরা হিন্দু সংহতির সঙ্গে যোগাযোগ করল। হিন্দু সংহতির জেলা নেতৃত্ব প্রদীপ কুমার দাস ও প্রদীপ মণ্ডল এই গ্রামে গিয়ে এলাকা পরিদর্শন করলেন এবং গ্রামবাসীকে পরামর্শ দিলেন তাদের দাবীতে অনড় থাকতে। তখন গ্রামবাসীরা সোজাসুজি গিয়ে ঐ নির্মাণ কাজে বাধা দিল। উত্তেজনা তৈরী হল, প্রশাসন এলো। ৪ঠা জুন ন্যাজাট (B.D.O.) অফিসে বিচার বৈঠক ডাকা হল। উভয় সম্প্রদায় থেকে ৬ জন করে প্রতিনিধিকে বৈঠকে ডাকা হয়। হিন্দু প্রতিনিধিদের মধ্যে হিন্দু সংহতির নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। প্রশাসনের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সন্দেশখালি ১ নং বিডিও, বি.এল.আর.ও., থানার ও.সি., সি.আই., পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, জনস্বাস্থ্য ও ল্যান্ডের দুই কর্মাধ্যক্ষ। বৈঠকের পরিবেশ ছিল উত্তপ্ত। কয়েকশ হিন্দু যুবক ন্যাজাট বিডিও অফিসের সামনে জড়ো হয়েছে। তাই দেখে প্রশাসন গাজীখালি থেকে মুসলিমদের ৭জন প্রতিনিধিকে পুলিশ প্রোটেকশান দিয়ে স্পেশ্যাল লঞ্চে করে ন্যাজাট নিয়ে আসে এবং বৈঠক শেষে তাদেরকে আবার বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়ে আসে।

বৈঠকে উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর প্রশাসনিক অধিকারীরা স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, উক্ত খাস জায়গায় কোনো ধর্মস্থান নির্মাণ করা যাবে না। ওখানে যথাস্থিতি বজায় থাকবে। একজন মুসলিম প্রতিনিধি বলে যে, কারোর বাড়ির ভেতরে তারা মসজিদ নির্মাণ করতে চায়। তাতেও বিডিও জানিয়ে দেন তার জন্যও ডি.এম.-এর অনুমতি নিয়ে করতে হবে। এককথায় হিন্দুদের জয় হল।

মৌলালীর যুবকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত জনতাপার্টির রাজ্য সম্মেলনে পার্টির সভাপতি ডঃ সুব্রাহ্মণিয়াম স্বামীকে পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করছেন হিন্দু সংহতির সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রীতপন ঘোষ।

আমাদের কথা

এ রাজ্যে পুলিশ ও প্রশাসন

পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তন হয়েছে একবছর হয়ে গেল। এই পরিবর্তনের বহু দিক আছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য দিক। কিন্তু সেসব দিকে পরিবর্তনের অর্থ যাই হোক না কেন, গ্রামাঞ্চলের হিন্দুরা এই পরিবর্তনের পর ক্রমেই কোণঠাসা হয়ে পড়ছে। হিন্দু এলাকায় জোর করে মসজিদ তৈরী হচ্ছে, সরকারি জমি - খাসজমির উপর মুসলমানদের দখল অবাধ গতিতে বাড়ছে। চুরি, ডাকাতি বেড়েছে। আর বেড়েছে ডাকাতির অজুহাতে ধর্ষণ। লাভ জেহাদের সংখ্যা বেড়েছে, ধর্ষণ বেড়েছে, বেড়েছে হিন্দু মন্দিরে চুরি আর হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের উপরে হামলা। তারানগর রূপনগরের মত ঘটনা সারা দেশে বিরল। এই অবস্থায় মানুষ ছুটে যায় পুলিশের কাছে। কিন্তু পুলিশ প্রশাসন নির্বিকার ও নিষ্ক্রিয়। তারা কয়েকটি সহজ উপায় অবলম্বন করে। প্রথমত, মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুর কোনো অভিযোগ গ্রহণ না করা, এমনকি কোনো দরখাস্ত বা আবেদন পত্র তারা স্ট্যাম্প দিয়ে রিসিভই করে না। এটা সম্পূর্ণ বেআইনি। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা - এদেশে সবথেকে বেশি বেআইনি কাজ পুলিশই করে। হিন্দুরা ডাইরি বা এফ.আই.আর করতে যদি একটু বেশি চাপ দেয় তাহলে অনেক পুলিশ অফিসার তাদেরকে ধমক দেয়, নোংরা ভাষায় গালাগালি দেয়, গ্রেফতার করার হুমকি দেয়। অনেক ক্ষেত্রে অভিযোগকারীদেরকেই গ্রেফতার করা হয়। অথচ পুলিশ অনেক সময় অতি সক্রিয় হয়ে পড়ে। তার উদাহরণও প্রচুর। যেমন ঢোলা থানার ভাজিনা বেনেপাড়ায় হাতেনাতে ধরা পড়া এক ডাকাতের গণপিটুনিতে মৃত্যু হওয়ায় ৬১জনের নামে কেস দেওয়া, জালাবেড়িয়ায় বামাল সমেত ধরা পড়ায় গণপিটুনিতে দুই ডাকাতের মৃত্যুর পর মাঝরাতে গ্রামের রেড করে আসামির খোঁজে হিন্দু মহিলাদের উপর প্রচন্ড অত্যাচার, এরকম আরো বহু ঘটনা। অথচ এই পুলিশই তারানগরে ঠুঁটো জগন্নাথ। এক কথায় পুলিশ প্রশাসন তাদের নিরপেক্ষতা পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছে, শাসকদলের ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছে। তার উপর মুসলিম ক্রিমিনালকে দেখলে কেঁচোর মত গুটিয়ে যাচ্ছে। এই প্রশাসনের উপরে গ্রামাঞ্চলে মিশ্র এলাকার হিন্দুরা সম্পূর্ণরূপে আস্থা হারিয়ে ফেলেছে পুলিশের এই দুমুখো আচরণ দেখে। তাই গণপিটুনির সংখ্যা বাড়তে লেগেছে। কিন্তু প্রশাসন নিরপেক্ষ ও সক্রিয় না হলে পশ্চিমবঙ্গের এই ইসলামিক আগ্রাসনকে রোখা যাবে না। হিন্দু পলায়ন বাড়বে, এলাকা হিন্দু শূন্য হবে। ভারতে পূর্ব প্রান্তে আবার একটা কাশ্মীর হওয়ার অশনি সংকেত দেখা যাচ্ছে। এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করবার জন্য বাংলার সমগ্র হিন্দু সমাজকে প্রস্তুত হতে হবে। এবং মাটি বাঁচানোর জন্য যুদ্ধের সংকল্প করতে হবে।

বাসন্তীতে হিন্দু প্রতিরোধ

বাসন্তী থানার অন্তর্গত ৭ সাত নং কুমড়াখালী গ্রাম। এই গ্রামে চোদ্দই মে রাতে ওঝা পাড়ায় শিবপূজা হচ্ছিল। অনেক মানুষ সেখানে উপস্থিত। হিন্দু সংহতির যুবকেরাও আছে। রাত্রি সাড়ে দশটায় হঠাৎ সব অন্ধকার। কারেন্ট চলে গিয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল আশপাশে কোথাও লোডশেডিং হয়নি। তখন ছেলেরা খুঁজতে লাগল কোথাও কানেকশান কেটে গিয়েছে কিনা। একটু খোঁজ করতেই বোঝা গেল যে, কাছের একটি মাদ্রাসাতে এই ঘটনাটা ঘটেছে। তখন স্বপন ওঝা ও টোটন ওঝা মাদ্রাসায় গিয়ে জোর করে আবার কানেকশান চালু করে দিল। পূজা আবার জোর উৎসাহের সঙ্গে চলতে থাকল। যখন ছেলেরা এই ঘটনা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে তখন টোটন বলল মাদ্রাসার এই কীর্তির কথা। জায়রুল নাইয়া নামে একটি মুসলিম ছেলে এই কথাগুলো শুনতে পেয়েছিল। সে এসে টোটনের কথার প্রতিবাদ করল ও টোটনকে মারা শুরু করল। তখন অন্য হিন্দু ছেলেরা টোটনকে বাঁচাতে এগিয়ে গেল। পরিস্থিতি উত্তপ্ত। আর একজন হিন্দু ছেলে গৌতম রায় কোনো রকমে মারপিট সামাল দেয় এবং ঠিক হল টোটন ও জায়রুলের অভিভাবকরা পরে বসে বিষয়টা মিটিয়ে নেবে। কিন্তু জায়রুল এত সহজে শান্ত হল না। সে দলবল জুটিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকল। সত্যেন ওঝা নামে একজন হিন্দু যুবক প্রাইভেট টিউশনি করিয়ে রাতে যখন ফিরছে তাকে একা পেয়ে জায়রুলের দলবল তাকে প্রচন্ড মারধর করল। এই খবর হিন্দু পাড়ায় পৌঁছতেই ছেলেরা ছুটে গেল সত্যেনকে বাঁচাতে। মুসলমানরাও তৈরী ছিল। মাঝরাতে লেগে গেলো মারপিট। হিন্দুদের তিনজনের মাথা ফাটল। তাদেরকে তাড়াতাড়ি ক্যানিং হাসপাতালে পাঠানো হল। ইতিমধ্যে মুসলমানদেরও আহত হল সাত থেকে আটজন। কিন্তু তারা আগে থেকেই দাগি আসামী হওয়ায় তারা সরকারি হাসপাতালে যেতে সাহস পেলো না। কাছাকাছি এলাকায় প্রাইভেট ডাক্তারখানায় গিয়ে চিকিৎসা শুরু করে। এই মাঝরাতে পুলিশ এলো, বাসন্তী থানার ও.সি. নিজে এলেন। তিনি উভয় পক্ষের সঙ্গে কথা বলে মীমাংসা করার প্রস্তাব দিলেন। অর্থাৎ কোনো পক্ষই যেন কেস না করে। গ্রামের ছেলেরা সংহতির নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করে এই প্রস্তাব মেনে নিল। কারণ খেলা সাত তিনে শেষ হয়েছে। তারপর আর কোর্টে দৌড়াদৌড়ি করে দরকার নেই। এই গ্রামে কয়েকমাস আগে এক গাজীসাহেবকে মারাকে কেন্দ্র করে হিন্দুদের ৬ জন ছেলে কেস খেয়েছে। তাদের জামিন করতে অনেক টাকা খরচ হয়েছে। এবং এখন তাদেরকে কোর্টে হাজিরা দিতে হচ্ছে।

রাজাপুরের প্রকাশ্য সভায় বক্তব্য রাখছেন হিন্দু সংহতির রাজ্য সম্পাদক সমীর গুহরায়।

১ম পাতার শেষাংশ

তারানগর রূপনগরে হিন্দু পলায়ন...

হয়েছে এবং লুট করা হয়েছে। বাধা দিতে গিয়ে প্রচন্ড মার খেয়েছে সুকুমার সরদার, মহাদেব নস্কর, কমলা নস্কর, স্বপ্না হালদার, আরতি হালদার, পদ্মা হালদার, উত্তরা হালদার, ভগবতী হালদার এবং আরো কয়েকজন। আক্রমণকারীরা এসেছিল রূপনগর খানপাড়া ও গাজীপাড়া, তারানগর মণ্ডলপাড়া ও মোল্লাপাড়া, দক্ষিণ বেলে নস্করপাড়া, কাকলা কোয়াবাটি, মহিষমারি ও পদুয়া মুসলিম পাড়া থেকে। টুম্পা নস্করকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল সেলিম, পিতা – আমির আলি খাঁন। আব্দুল্লা খাঁন, পিতা – আরফত, সইদুল খাঁন, পিতা – আরফত, ও জাকির খাঁন, পিতা – খালেক। এই বিশাল দুর্বৃত্ত বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিল জলিল খাঁন, খালেক মোল্লা, রাজু মোল্লা, আলাউদ্দিন খাঁন, রেজ্জাক খাঁন, কাদের খাঁন এবং আরো অনেকে। সওকত খাঁনের বাড়ির ছাদের উপরে দুই গৃহবধূর উপর যারা অত্যাচার করেছে, তাদের নাম নূরজামাল খাঁন, গোলাম বারি খাঁন, জলিল খাঁন, জেন্না খাঁন, কুতুবউদ্দিন খাঁন, শাজাহান খাঁন, সাজির খাঁন, খালেক খাঁন, আজিত খাঁন ও সেলিম খাঁন।

বিকালবেলায় যখন র‍্যাফবাহিনী এসে এই দুই মহিলাকে উদ্ধার করে তখনও তারা সওকত খাঁনের বাড়ির ছাদে হাতে পায়ে শিকল বাঁধা অবস্থায় পড়েছিল। পুলিশ তাদেরকে থানায় নিয়ে গেল না, হাসপাতালে নিয়ে গেল না, শুধু হিন্দু অধ্যুসিত জীবন মণ্ডলের হাটে এসে ছেড়ে দিয়ে গেল। সেখানে একটি ঔষধের দোকানে অতি সামান্য প্রাথমিক চিকিৎসার পর এই দুই মানহারা মানবীকে তাদের আত্মীয় স্বজন সরিয়ে নিয়ে গেল। তাদের এখন সন্ধান পাওয়া কঠিন। তারা কি আর কোনো দিন নিজ গ্রামে এসে মুখ দেখাতে পারবে। এত বড় ঘটনার হোলো না কোনো কেস, কোনো ডায়রি, কোনো মেডিকেল টেষ্ট।

কয়েকঘন্টা ধরে লুটপাট, অগ্নি সংযোগ ও অত্যাচারের পর যখন খবর পেয়ে গ্রামবাসীরা অনেকেই গ্রামে ফিরে এসেছে ও একজোট হয়ে জয়নগর থানায় অভিযোগ জানাতে যাচ্ছিল, তখন পুলিশ তাদেরকে বাধা দিল ও থানায় যেতে দিলো না। অত্যাচার ও নিপীড়নের শিকার গ্রামবাসীরা থানায় কোনো অভিযোগই করতে পারল না।

এই ভয়ঙ্কর ব্যাপক হিন্দু নিপীড়ন ও নির্যাতনের পিছনে কারণটা কী ছিল? ঘটনার দিন অর্থাৎ চোদ্দই মে সকালে এই গ্রাম থেকে ৪ কিলোমিটার দূরে দাঁড়ার মোড়ে খুন হয়েছিল জনৈক এস.ইউ.সি. নেতা সওকত খাঁন। অভিযোগ – সি.পি.আই.এম-এর হালদার গোষ্ঠীর লোকেরা সওকত খানকে খুন করেছে। সিপিএম ও এস ইউ সি এই দুটি বামপন্থী দলের খুনোখুনির ইতিহাস খুব দীর্ঘ। প্রায় ষোলো বছর আগে এস.ইউ.সি.'র হাতে খুন হয়েছিলেন বিজেপি নেতা বিমল হালদার। সেই সময় সারা দেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও বিজেপির কাজে কিছুটা জোয়ার এসেছিল। কিন্তু বিমল হালদার খুনের পর কোনো বিজেপি নেতাই তাদের পাশে এসে না দাঁড়ানোয় সব হালদাররা একসঙ্গে সিপিএম-এ যোগ দিল আত্মরক্ষার তাগিদে। তাই এবার সওকত খুনের পর মুসলিমরা যখন দুটি গ্রামের একের পর এক হিন্দু পাড়া আক্রমণ করছিল তাদের মুখে একটাই কথা – তোরা হিন্দুরা সব জানিস সওকতকে কে মেরেছে, তাই তোদের গ্রাম আমরা জ্বালিয়ে দেব। অথচ বাস্তব ঘটনা সম্পূর্ণ অন্যরকম। রূপনগর গাজীপাড়ার আহাদ গাজী সিপিএমের নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য। আর নিহত সওকত-এর ছেলের বৌ ঐ গ্রামের পঞ্চায়েতের কাজের সুপারভাইজার। এই গাজী পরিবার ও খাঁন পরিবারের পারিবারিক ঝগড়া দীর্ঘদিনের। এই খুনের মাত্র পনেরো দিন আগেও পঞ্চায়েতের অধীনে রাস্তার একটা কাজ পাওয়া নিয়ে সওকত খানের সঙ্গে আহাদ গাজীর পঞ্চায়েত অফিসেই প্রচন্ড ঝগড়া হয় এবং অনেক লোকের সামনে তারা পরস্পরকে খুনের হুমকি দেয়। তা সত্ত্বেও সওকত খান খুনের পর মুসলমানদের সমস্ত আক্রোশ পড়ল শুধুমাত্র হিন্দুদের উপর। এস.ইউ.সি., সি.পি.এম পরস্পর শত্রু। এস.ইউ.সি. নেতা খুন হল কিন্তু সি.পি.এম করা কোনো মুসলমানের বাড়ির উপর হামলা হল না। সওকতের চরম শত্রু আহাদ গাজীর বাড়িতে হামলা হোলো না। গাজীপাড়ায় হামলা হোলো না। হামলা হোলো শুধু হিন্দুদের বাড়িতে, কোনো হিন্দু পাড়া বাদ গেলো না। এস.ইউ.সি. পার্টি করা হিন্দুর বাড়িও বাদ গেলো না। এইরকম ঘটনা একের পর এক ঘটে চলেছে। তাই জয়নগরে হিন্দুদের চোখ খুলছে। রাজনীতির রঙিন চশমা পরিয়ে তাদেরকে আর ভুল বোঝানো যাবে না।

তারানগর রূপনগরের এই বীভৎস ভয়ঙ্কর হিন্দু নির্যাতনের পর প্রথম এগিয়ে এসেছে হিন্দু সংহতি। হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে দুদফায় প্রায় ২০,০০০ টাকার ত্রাণ সামগ্রী দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে। তারপর আর.এস.এস.-এর কর্মকর্তারা এসে ত্রিশটি পলিথিনের ত্রিপল দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। তারপর ভারত সেবাশ্রম সংঘ পঞ্চাশ পিস্ টিন দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। ঘটনা ঘটার দশ দিন পরেও সরকারের পক্ষ থেকে কোনো অফিসার, বিডিও, এসডিও এই গ্রাম পরিদর্শনে আসেননি। আসেনি কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা। সকলেরই ভয়-হিন্দুদের প্রতি সহানুভূতি দেখালে মুসলমান ভোট চলে যাবে। এমনকি এই বুথের নির্বাচিত সিপিএম সদস্য ও অঞ্চলপ্রধান পর্যন্ত এই অত্যাচারিত মানুষগুলির কাছে একবারও আসেনি।

হিন্দু সংহতি এই গ্রামদুটিতে কয়েকবার পরিদর্শন করে বিস্তৃত সমীক্ষা করেছে। সেই সমীক্ষার রিপোর্ট তৈরী হয়েছে। তা থেকে জানা গিয়েছে এই ঘটনার পর একশ ছিয়াশি (১৮৬) জন মানুষ গৃহত্যাগ করেছে। তারা আর গ্রামে ফিরে আসেনি। দুসপ্তাহ পরের রির্পোট—ঐ অঞ্চলের অন্যান্য গ্রাম থেকেও হিন্দুদের গ্রামত্যাগ শুরু হয়েছে। এতবড় ঘটনাতেও মিডিয়ার আলো পড়েনি। তাই দেশবাসী জানতে পারছে না যে পশ্চিমবঙ্গ আর একটা কাশ্মীর তৈরী হচ্ছে কিনা।

মন্দিরে এত সোনা কেন?

তপন কুমার ঘোষ

শুধু সোনা নয়, রুপো, হীরা, মণি-মাণিক্য প্রভৃতি অনেক অতি মূল্যবান বস্তু এবং প্রভূত অর্থ দেশের হাজার হাজার মন্দিরে জমা হয়ে আছে। বিশেষ করে বিগত প্রায় তিন চার বছর ধরে প্রায়ই খবর আসছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বহু মন্দিরে চুরি হচ্ছে। চোরেদের প্রধান লক্ষ্য এইসব সোনাদানা। এইসব ঘটনায় মন্দিরের ভক্তরা এবং এলাকাবাসী খুবই ক্ষুব্ধ। অনেক ক্ষেত্রেই এলাকাবাসীদের সন্দেহ অন্য ধর্মের লোকেদের দিকে যাচ্ছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পুলিশ চোর ধরতে ও মন্দিরের চুরি যাওয়া সম্পদ উদ্ধার করতে ব্যর্থ। এতে মানুষের ক্ষোভ আরো বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমার মনে প্রশ্ন উঠেছে – মন্দিরে এত সোনা কেন?

এটা ঠিক যে, আমাদের দেশের মন্দিরগুলিতে সোনাদানা, মণি-মাণিক্য জমা হওয়ার ইতিহাস অনেক পুরোনো। গজনীর সুলতান মামুদের দ্বারা গুজরাটের সোমনাথের মন্দির বারবার লুট হওয়া এবং শত শত উটের পিঠে বোঝাই করে সোনাদানা নিয়ে যাওয়ার ইতিহাস সবাই জানে। তাই এই পরম্পরা যথেষ্ট পুরানো। কিন্তু পুরানো বলেই কি এই পরম্পরা সঠিক বলে মেনে নেওয়া উচিত? যুক্তি তর্কের কষ্টিপাথরে এই পরম্পরাগুলি একবার যাচাই হওয়ার দরকার নেই কি? সেই উদ্দেশ্যেই এই লেখা। তাই কিছু প্রশ্নের উত্তর খোঁজা দরকার। প্রশ্নগুলি খুব কঠিন নয়, কিন্তু দরকারী। সমস্ত মন্দিরে মন্দিরে এত সোনাদানা ও অর্থ কে দেয়, কেন দেয়, কাকে বা কার উদ্দেশ্যে দেয় এবং তা কী কাজে লাগে? উত্তর – ভক্তরা দেয়। ভক্তিতে অথবা দেবতাকে খুশী করতে ও তাঁর আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য দেয়। উক্ত মন্দিরে দেবতার উদ্দেশ্যে দেয়। শেষ প্রশ্নটি অর্থাৎ এগুলি কী কাজে লাগে? এর উত্তর সব মন্দিরের ক্ষেত্রে একরকম নয়। কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এই বিপুল সম্পদ শুধু জমা থাকে, কোনো কাজে লাগে না। কিছু বছর হল অল্প কিছু মন্দির কিছু সেবামূলক ও উন্নয়নমূলক কাজ করছে। আর কিছু মন্দির এই সোনা দিয়ে পাত তৈরী করে মন্দিরের সোনার চূড়া তৈরী করে। অর্থাৎ সেটাও কোন কাজে লাগে না। এইবার প্রশ্ন ও উত্তরগুলিকে একটু বিশ্লেষণ করা যাক। সোনাদানা দেয় কে – ভক্তরা দেয়। এর মধ্যে বিশ্লেষণের কিছু নেই। দ্বিতীয় প্রশ্ন – ভক্তরা কেন দেয়? উত্তর – দেবতাকে খুশী করতে এবং তাঁর আশীর্বাদ পেতে দেয়। তাহলে কি আমাদের দেবতারা সোনাদানা ও অর্থের লোভী, নাকি তাঁদের এসবের প্রয়োজন আছে? এই দুটি প্রশ্নের উত্তরই তো হ্যাঁ হতে পারে না। আমাদের দেবতারা সোনাদানা বা অর্থের লোভী এটা তো কোনো ভক্তই মেনে নেবে না। আর দেবতাদের অর্থ বা সোনাদানা কোনোরকম প্রয়োজন আছে – এটাও নিশ্চই কেউ মনে করে না। তাহলে ভক্তরা কী করে মনে করে যে, সোনাদানা ও অর্থ পেলে দেবতা সেই ভক্তের উপর খুশী হবেন? মন্দিরে দেবতার পায়ে ভেট চড়ানো কোনো ভক্তই এর উত্তর দিতে পারবেন না। তৃতীয় প্রশ্নটি ছিল ভেট কাকে দেয়? উত্তর – ভগবানকে বা দেবতাকে দেয়। এই উত্তরে কোনো জটিলতা নেই। তবু প্রশ্ন থাকে – ভগবান কি শুধু এই মন্দিরেই আছেন? ''সর্বভূতে ঈশ্বর বিরাজমান'', ''যা পিন্ডে তাই ব্রহ্মান্ডে'', ''তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষা চাষ.....'' ইত্যাদি জ্ঞানগর্ভ বাক্যগুলি কি শুধুই কথার কথা?

এইবার আসি শেষ প্রশ্নটিতে। এই বিপুল সোনাদানা ও অর্থ কী কাজে লাগে? অভিজ্ঞতায় বলে – বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই কোনো কাজে লাগে না। মন্দির পরিচালনার জন্যে কিছু অর্থ প্রয়োজন। সেই অর্থ ভক্তদের দক্ষিণা থেকে আসে, সেটা নিশ্চয়ই কাজের, তাই তাতে দক্ষিণার অর্থ খরচ হলে কারোর কোনো প্রশ্ন বা আপত্তি নেই। কিন্তু যে অর্থ ও সোনাদানা শুধু জমা হচ্ছে তা তো কোনো কাজে লাগে না। এমনকি আমাদের দেশ যদি বিদেশী রাষ্ট্র দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখনও কি কোনো মন্দির দেশের প্রতিরক্ষার জন্য ওই জমা সম্পদের কিছু অংশ দেবে? দেবে না। স্বাধীন ভারত ৪টি বড় যুদ্ধ লড়েছে পাকিস্তান ও চীনের সঙ্গে। এইসব যুদ্ধে, বিশেষ করে ৬৫-তে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে সাধারণ মানুষ, মহিলারা তাদের অর্থ ও গহনা ঢেলে দিয়েছিল দেশের প্রতিরক্ষা তহবিলে। কিন্তু বড় বড় মন্দিরের কোন দানের কথা অন্ততঃ আমি শুনিনি। তাহলে এই অলস সম্পদ কি দেশ ও সমাজের জন্য ঠিক?

হয়ত কেউ কেউ বলতে পারেন যে মানুষ যখন ভক্তিতে দিচ্ছে তখন এইসব প্রশ্ন তোলার অধিকার আছে কিনা! এ প্রশ্নটাও একটু তলিয়ে ভাবা যাক। উদাহরণ – ছাত্ররা শিক্ষককে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে। তাহলে সেই শ্রদ্ধা ও ভক্তি পেয়ে শিক্ষকদেরও এই ছাত্রদের প্রতি একটা দায়িত্ব, কর্তব্যবোধ ও দায়বদ্ধতা জন্মায় না কি? শিক্ষক যদি সেই দায়বদ্ধতা স্বীকার না করেন ও দায়িত্ব পালন না করেন তাহলে সেই শিক্ষককে সমাজ কি ভালো চোখে দেখবে? মা-বাবার প্রতি সন্তানের ভক্তি থাকা উচিত। কিন্তু একইসঙ্গে সেই সন্তানের প্রতি মা-বাবার কর্তব্যবোধ থাকা উচিত নয় কি? তাহলে, ভক্তরা তো দেবতাকে ভক্তি করছে এবং ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ সোনাদানা টাকা পয়সা দিচ্ছে। সেই সম্পদ কোনো দেবতাই গ্রহণও করছেন না, দেবতার কোনো কাজে লাগছে না, তা জমা থাকছে মন্দির কর্তৃপক্ষ অথবা ট্রাষ্টি বা অছি-র কাছে। তাই ভক্তদের ভক্তির বস্তুগত অংশটা যাদের হাতে যাচ্ছে, তাদের এই ভক্তদের প্রতি বা সার্বিক দৃষ্টিতে পুরো সমাজের প্রতি একটা দায়িত্ববোধ বা কর্তব্যবোধ বা দায়বদ্ধতা থাকা উচিত নয় কি? মন্দির কর্তৃপক্ষরা সেই দায়বদ্ধতার কোনো পরিচয় দিচ্ছেন কি? না, তারা দিচ্ছেন না। অর্থাৎ তাঁরা কর্তব্যচুত হচ্ছেন, তাঁরা ভক্তির লাভটা ভোগ করছেন দায়বদ্ধতা শূন্য হয়ে।

আরো সহজ করে বললে, যে সকল মন্দিরে প্রভূত সম্পদ আছে, তারা একটা করে হাসপাতাল কেন চালাবেন না? একটা করে নিঃশুল্ক পাঠ্যপুস্তকের লাইব্রেরী কেন সেই মন্দির সংলগ্ন হয়ে থাকবে না? একটা করে সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্র কেন সেখানে থাকবে না? গরীব অথচ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদেরকে বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা সেই মন্দিরের পক্ষ থেকে কেন থাকবে না? একটা জলসত্র মন্দিরের বাইরে কেন থাকবে না? মন্দিরের কাছাকাছি কোন একটি দরিদ্র পল্লী বা বস্তির উন্নয়নের দায়িত্ব সেই মন্দির কেন নেবে না? এগুলো কি করার দায়িত্ব শুধুই কেন্দ্র সরকার, রাজ্য সরকার, রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ আর খ্রীষ্টান মিশনারীদের? এই কথাগুলি ভাবলে মন্দির ট্রাষ্টি বা মন্দির কর্তৃপক্ষের একটুও লজ্জা হয় না? বহু মন্দির তো এলাকার উন্নয়ন তো দূরের কথা, নিজেদের মন্দির প্রাঙ্গণটিকে পর্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত রাখতে পারে না। তাহলে মন্দিরে মন্দিরে জমা হওয়া এই বিপুল সম্পদ নিয়ে তারা কি সোমনাথের মত সেই দুর্ভাগ্যের জন্য অপেক্ষা করে থাকবে? তারই ক্ষুদ্র রূপ হল মন্দিরে আজকের চুরি ডাকাতিগুলো।

সুতরাং ভক্তদের একবার ভাবার সময় এসেছে যে, ভগবানের সৃষ্টিতে মানুষের জন্য তিনটি প্রবৃত্তি ও মার্গ আছে – জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম। কোনটা ছোটো নয় কোনোটা বড় নয়। তিনটেই যোগ রূপে স্বীকৃত। জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ। ভক্তরা যেন ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে জ্ঞান ও কর্মকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে না যান। তাদের দেওয়া সোনাদানা ও অর্থ দেশ ও সমাজের কোনো কাজে তো লাগলই না, বরং এই সম্পদের লোভেই বিধর্মী তস্করেরা এসে শুধু সম্পদই নেবে না, আমাদের পূজিত দেব মূর্তিকেও অপহরণ করবে, ভাঙবে ও অপবিত্র করবে। ভক্তদের কি সেটা খুব ভালো লাগবে? আর এগুলো করবে নয়, এগুলো প্রায়ই হচ্ছে ও ঘটছে। দেগঙ্গা তার উদাহরণ।

এককথায় মন্দিরগুলি সামাজিক কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়েছে। মন্দিরের জন্য সামাজিক কর্তব্য পালন করা খুবই দরকার এই কারণে যে আমাদের সমাজ ধর্ম আধারিত। সেই ধর্মের কেন্দ্র মন্দিরগুলি। তাই মন্দির থেকেই সামাজিক কর্তব্য পালন করতে হবে। আর মন্দিরগুলি যদি সেকাজ করতে না পারে তাহলে ভক্তদেরও একটুখানি জ্ঞানমার্গের চর্চা করে এই মন্দিরে সোনাদানা দিয়ে দেবতাকে খুশি করার কুচেষ্টা বন্ধ করতে হবে। দেবতার সন্তানরা অভুক্ত ও কষ্টে থাকবে, অপমানিত ও ধর্ষিতা হবে, আর দেবতার আলয়ে জমা হবে বিপুল সম্পদ, এতে দেবতা কখনই খুশি হতে পারেন না। তাই ভক্তরা মন্দিরে গিয়ে ভক্তি দিন, ভগবানকে প্রাণভরে ডাকুন। কিন্তু মন্দিরের বাইরে গিয়ে তাঁর শক্তি সামর্থ্য ও অর্থ দিয়ে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্তব্য পালন করুন। কেরলের অতি বিখ্যাত মন্দির গুরু বায়ুর এবং অতি বিখ্যাত তীর্থযাত্রা সবরীমালা যাত্রা। এই কেরলই জন্ম দিয়েছিল আদি শংকরাচার্যের। যিনি একসময় কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, আর কচ্ছ থেকে কামরূপ পর্যন্ত হিন্দুধর্মকে পুনরুজ্জীবন দান করেছিলেন। সেই কেরলেই আজ হিন্দুর সংখ্যা কমতে কমতে ৫৬ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। আর মাত্র কয়েক দশক পর এই গুরুবায়ুর মন্দিরের কী অবস্থা হবে? আর সবরীমালা যাত্রা অমরনাথ যাত্রার মত সেনাবাহিনীর পাহারাতে করতে হবে না তো? মানুষরা তাদের ভক্তি গুরুবায়ুর ও সবরীমালাতে ঢেলে দিয়েছে। কিন্তু সেই বিপুল ভক্তি কেরলের এই পরিণাম আটকাতে পারলনা। তাই, হয় মন্দিরগুলিকে পাল্টাতে হবে অথবা ভক্তদেরকে নিজেদের পরিবর্তন করতে হবে। তাই আসুন সবাই মিলে একবার প্রশ্ন তুলি, ''মন্দিরে এত সোনা কেন''?

শ্রীলঙ্কার মসজিদে শুক্রবারের নামাজ বন্ধ করে দেওয়া হল

সম্প্রতি শ্রীলঙ্কার একটি শহর ডাম্বুলাতে মসজিদে শুক্রবারের নামাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। যথেষ্ট উত্তেজনা সৃষ্টি করেও মুসলমানরা বিশেষ কিছু সুবিধা করতে পারে নি। তার কারণ ২,০০০ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী (সন্ন্যাসী সহ) মসজিদের দিকে বীর বিক্রমে মার্চ করা এবং তার ধ্বংসের জন্য একটি প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলা। B.B.C. থেকে প্রাপ্ত সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, মসজিদের একজন আধিকারিক B.B.C. সাংবাদিককে জানায়, বিক্ষোভ চলাকালীন তারা মসজিদে আটকে পড়ে ছিলেন এবং অত্যন্ত ভয় পেয়েছিলেন যে মসজিদটিকে ধ্বংস করা হতে পারে। মসজিদটির উপরে একটি বোমা ছোঁড়া হয়, যদিও কেউ হতাহত হয়নি। এইসব ঘটনার জন্য মসজিদটিকে তাড়াতাড়ি খালি করে শুক্রবারের নামাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। B.B.C. সংবাদদাতার অনুসারে বহু সংখ্যক বৌদ্ধরা ডাম্বুলাকে অত্যন্ত পবিত্র শহর হিসাবে মনে করেন এবং গত কয়েক মাসে মুসলিমদের দ্বারা সংগঠিত সংঘর্ষ সেখানে অস্থিরতা সৃষ্টি করছে। সেপ্টেম্বর,১২১১-তে একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এক বিশাল জনতাকে নেতৃত্ব দিয়ে অনুরাধাপুরাতে একটি ইসলামিক ধর্মস্থান ধ্বংস করেন। অনুরাধাপুরা ডাম্বুলার খুব কাছেই। প্রসঙ্গানুসারে শ্রীলঙ্কার সংখ্যাগুরু জনসাধারণ হল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।

[সূত্র –bbc.com]

আহা! আমাদের আমির খান

বহু হিন্দু মেয়েদের হার্টথ্রব আমির খান। বহু জনপ্রিয় সিনেমার নায়ক এই খান। এই আমির খান উদার ও ধর্মনিরপেক্ষ নাকি সংকীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক? এই অভিনেতাটি দুটি বিয়ে করেছে। দুটিই হিন্দু মেয়ে। রীনা দত্ত ও কিরণ রাও। প্রথমজন আবার বাঙালি। সদ্য একটি সাক্ষাৎকারে ধর্ম সম্বন্ধে আমির খান তাঁর বক্তব্য জানিয়েছেন। একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন, তিনি একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান এবং আল্লার উপরে তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস আছে। তিনি আরও জানিয়েছেন, তিনি একজন সেলিব্রিটি হওয়ায় প্রতিদিন পাঁচবার নামাজ পড়া অথবা মসজিদে যাওয়া তাঁর পক্ষে খুব কঠিন। তাই তিনি প্রতিটি শ্বাস প্রশ্বাসে আল্লার কাছে প্রার্থনা করেন। আর একটি প্রশ্নের উত্তরে আমির খান জানিয়েছেন যে, তার হিন্দু পত্নীদেরকে তিনি ইসলাম ধর্ম পালন করতে জোর করেননি। কিন্তু তাদেরকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর সন্তানেরা শুধুমাত্র ইসলাম ধর্মই পালন করবে, অন্য কোনো ধর্ম নয়। সাক্ষাৎকারটি এখানেই শেষ। এইবার আমির ভক্তরা বুঝে নিন তাদের প্রিয় অভিনেতা ধর্মনিরপেক্ষ না সাম্প্রদায়িক? এবং তাঁর সন্তানদের উপরে তাদের মায়ের কতটা অধিকার তিনি বরদাস্ত করবেন।

[সূত্র ঃ www.santabanta.com/cinema.asp?pid=39457]

জালাবেড়িয়ায় বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের সঙ্গে হিন্দু সংহতির নেতৃত্ব

জালাবেড়িয়ার নিষ্পেষিত হিন্দুরা সব পার্টিকেই পরিত্যাগ করেছে

জালাবেড়িয়া স্কুলবাড়ির মাঠে ২৩মে হিন্দু সংহতির প্রকাশ্য সভায় বক্তব্য রাখছেন সভাপতি তপন ঘোষ

গত ১ জুন, শুক্রবার, দুপুর সাড়ে এগারোটার সময় জালাবেড়িয়া অঞ্চলে জনৈক এক ব্যক্তি ভাগ্নীর বিয়ের জন্য ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে ফিরছিল। সেইসময় তিনজন মুসলমান দুষ্কৃতি টাকা ছিনিয়ে নিয়ে চম্পট দেয়। চোর চোর বলে চিৎকার করলে আশেপাশের লোকজন মুসলমান দুর্বৃত্তদের তাড়া করে। দুজন ধরা পড়ে যায়। ধরা পড়ার পর তাদের উপর গণপিটুনি চলতে থাকে। ইতিমধ্যে মুসলমানরা কুলতলি থানায় খবর দিলে কুলতলি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। ততক্ষণে গণপ্রহারে দুজন ডাকাতেরই মৃত্যু হয়েছে। অতি তৎপর পুলিশ (অথচ তারানগরে হিন্দু ঘর পুড়লে ও হিন্দু মহিলা আক্রান্ত হলে পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকে) বডি দুটিকে সরিয়ে নেয় ও ১৭ জন হিন্দুর বিরুদ্ধে কেস দেয়।

৩ জুন জালাবেড়িয়া গ্রামে পুলিশ এলেও হিন্দু প্রতিরোধে তারা ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এরপর ৪ জুন রাত সাড়ে এগারোটা-বারোটার সময় কুলতলি থানার পুলিশ আবার জালাবেড়িয়া গ্রামে আসে। অঞ্জলি নস্কর, সন্ধ্যা শিকারি, মলিনা নস্কর, সন্ধ্যা বৈরাগী, পূর্ণিমা বৈদ্যর কথায় জানা যায়, পুলিশের সঙ্গে পুলিশের পোশাক পরে ও বোরখা পরে মুসলমান গুণ্ডা এসেছিল। তারা গ্রামে এসে হিন্দু মহিলাদের কাপড় ধরে টানে, কাপড় ছিঁড়ে দেয়, গায়ে হাত দেয় ও অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। নিমাই শিকারি ও রুইত নস্কর নামে দুজন হিন্দুকে গ্রেপ্তার করে কুলতলি থানায় নিয়ে যায়। কুলতলি থানা তাদের নামে 341, 325, 326, 304/34 ধারায় কেস (কেস নং 178/2012) দেয়। পুলিশের এই অমানবিক আচরণে জালাবেড়িয়াসহ আশপাশের হিন্দু গ্রামগুলো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। মাঝরাত থেকেই দেড় হাজার হিন্দু রাস্তা অবরোধ করে। 'হিন্দু সংহতি' হিন্দুদের এই গণবিক্ষোভে নেতৃত্ব দেয়। বি. ডি. ও অফিসে মীমাংসাসূচক মিটিং ডাকা হয়। সেখানে বিডিও, এস. ডি. ও, অ্যাডিশনাল এস. পি. উপস্থিত ছিলেন। বি. ডি. ও অফিসে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের দেখে হিন্দুরা স্পষ্ট ভাষায় জানায় হিন্দু সংহতির নেতৃত্বেই তারা এই মিটিং করবে। এও তারা জানায়, কোন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি সেখানে থাকতে পারবে না, কারণ দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে হিন্দুরা জানে মুসলিম ভোট প্রত্যাশী রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধিরা আপসে একটা মীমাংসা করে মুসলিমদেরই স্বার্থরক্ষা করবে।

মিটিং-এ বি. ডি. ও, এস. ডি. ও, অ্যাডিশনাল এস. পি. হিন্দু মহিলাদের উপর অত্যাচারের প্রতিকার ও ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেও কার্যক্ষেত্রে তার কিছুই হয়নি। কুলতলি থানার পুলিশ ও সেদিন রাতে আসা মুসলমান দুর্বৃত্তদের মধ্যে চারজনকে গ্রামবাসীরা চিনতে পেরে (এরা হল বাক্কা গাজি, মজিদ গাজি, কালো গাজি ও মাকব গাজি) তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হয়। বি. ডি. ও অফিস থেকে প্রতিশ্রুতি দিলেও এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে কিছু করেনি। দুর্বৃত্তেরা বুক ফুলিয়ে এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার জয়নগর কুলতলির অবস্থা অগ্নিগর্ভ। পুলিশি মদতে মুসলমানদের অত্যাচার হিন্দুর অন্দরে এসে পৌঁছেছে। জালাবেড়িয়ার নিষ্পেষিত হিন্দুরা তাই সব পার্টির উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। এখন একমাত্র ভরসা হিন্দু সংহতি। হিন্দু সংহতির ছত্রছায়ায় দাঁড়িয়ে জয়নগর-কুলতলির হিন্দুরা আজ জীবন-মরণ সংগ্রামের প্রতিজ্ঞা করেছে।

মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণ বাড়ানোর দাবী

গত ২২ এপ্রিল তারিখে তামিলনাড়ুর মন্দির নগরী মাদুরাইতে মুসলিম সংগঠন পি.এফ.আই. (Popular Front of India) একটি বিশাল মিছিল বের করে। শহরের নেলপেট্টি থেকে বেরিয়ে এই বিক্ষোভ মিছিল শেষ হয় স্কট রোডে। সেখানে বক্তারা দাবী তোলেন যে রাজ্যে চাকুরিতে মুসলমানদের সংরক্ষণ ৩.৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৭ শতাংশ করতে হবে। তাছাড়াও তাঁরা রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশনের সুপারিশ উদ্ধৃত করে দাবী করেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত চাকরিতে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলিমদের জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণ দিতে হবে।

এই সভায় বক্তা ছিলেন মহম্মদ নাসিরুদ্দিন, এম. মহম্মদ আলি জিন্না, কে.এস.এম. ইব্রাহিম এবং আরও অনেকে। সভায় স্বেচ্ছাসেবকরা এসেছিল মাদুরাই, বিরুধনগর, শিবগঙ্গা, থেনি, রামনাথপুর ও ডিন্ডিগুল জেলা থেকে। এই মিছিলের জন্য পুলিশের ব্যাপক বন্দোবস্ত ছিল।

(সূত্র ঃ দি হিন্দু পত্রিকা, ২৩-৪-১২)

পাকিস্তানি দুষ্কৃতিদের জেল

৯জন মুসলিম পাকিস্তানিকে, যারা উত্তর-পশ্চিম ইংলন্ডের বাসিন্দা সম্প্রতি তাদের জেলে পাঠানো হয়। কারণ তারা শ্বেতাঙ্গ খ্রীষ্টান কিশোরী মেয়েদেরকে ড্রাগস্ ও মদ খাইয়ে দেহ ব্যবসায় নিযুক্ত করেছিল। দুষ্কৃতিকারীদের বয়স ২২-৫৯-এর মধ্যে। শ্বেতাঙ্গ ও তাদের ধর্মের প্রতি অসীম ঘৃণা থেকেই তারা এই কাজে লিপ্ত হয়েছিল। সমস্ত ইংলন্ডে এই ঘটনা দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করে। কয়েকটি দক্ষিণপন্থী দল এর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ শুরু করেছে। ব্রিটিশ সরকার তার দেশের শিশুদের সুরক্ষা দিতে অক্ষম, এই ধারণা বহু লোককে আলোড়িত করছে। ঘটনাটি বিচারের সময় বহু পাকিস্তানি আদালত চত্বরে উপস্থিত ছিল এবং তাদের সামনে বিচারপতি বলেন সমগ্র ঘটনাটি হচ্ছে বর্ণবৈষম্য ও ধর্মীয় বিদ্বেষের এক নির্লজ্জ উদাহরণ। জানা গিয়েছে, শ্বেতাঙ্গ কিশোরীদের চূড়ান্ত রকমের যৌন হেনস্থা করা হত। ট্যাক্সি, কাবাবের দোকান এবং বিভিন্ন অ্যাপার্টমেন্টে। মুসলমান দুষ্কৃতিদের দ্বারা কিশোরীদের শুধুমাত্র গণধর্ষণই নয়, চূড়ান্ত রকমের অত্যাচার ও জোর করে দেহ ব্যবসায় লিপ্ত করা হত। কিশোরীদের কথা অনুসারে তাদের প্রতি রাতেই অন্য পুরুষদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হত এবং তাদের এতটা নেশাগ্রস্থ করে দেওয়া হত, যে তাদের এই বিকৃত অত্যাচার প্রতিরোধ করার মতো শক্তি থাকত না। দুষ্কৃতিদের নেতা (বয়স ৫৯) ১৯ বছরের দন্ডাদেশ পেয়েছে ও অন্যদের ৪-১২ বছরের দন্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে।

[সূত্র – টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া, ৯ই মে,২০১২]

মুসলিম ছাত্রীদের সাইকেল দেবে রাজ্য সরকার

সরকারি প্রকল্পের কথা প্রচারের জন্য মুসলিম ইমামদের আড়াই হাজার টাকা করে মাসোহারা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। এ বার মুসলিম মেয়েদের জন্য বিনামূল্যে সাইকেল দেওয়ার কথা ঘোষণা করল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার। সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতরের প্রস্তাবিত বাজেটে এই প্রকল্পের জন্য অর্থ বরাদ্দ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মাদ্রাসা এবং সাধারণ স্কুল, দু'ক্ষেত্রের নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির মুসলিম ছাত্রীদের সাইকেল দেওয়া হবে। তবে রাজ্যের সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতর সূত্রে খবর, শুধুমাত্র মুসলিম দরিদ্র ছাত্রীদেরই সাইকেল দেওয়া হবে।

বছর ঘুরলেই রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোট। তার আগে সংখ্যালঘুদের জন্য একগুচ্ছ প্রকল্প ঘোষণা করে ওই নির্বাচনের আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের পায়ের তলার মাটিকেই শক্ত করার চেষ্টা করছেন বলে মনে করা হচ্ছে। দফতর সূত্রে খবর, সমস্ত প্রক্রিয়া শেষ করে পড়ুয়াদের হাতে সাইকেল পৌঁছতে আরও মাস ছয়েক লেগে যাবে। ততদিনে পঞ্চায়েত নির্বাচনের দামামা বেজে যাবে।

সংখ্যালঘু দফতরের কর্তারা জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই সাইকেল বিলি খাতে টাকা খরচের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি চেয়ে অর্থ দফতরে ফাইল পাঠানো হয়েছে। অনুমতি পাওয়ার পর দফতরের পক্ষ থেকে মাদ্রাসা পর্ষদ ও ডাইরেক্টর অফ স্কুল এডুকেশনের কাছে চিঠি পাঠিয়ে ওই সব ক্লাসে পাঠরত মুসলিম মেয়েদের তালিকা চাওয়া হবে। তার পরেই জেলা ভিত্তিক সাইকেলের টাকা বরাদ্দ করা হবে। তবে কোনও ক্ষেত্রেই নগদ টাকা মেয়েদের হাতে দেওয়া হবে না। দেওয়া হবে সাইকেল।

(সূত্র ঃ আনন্দবাজার, ১৭-৪-১২)

জেহাদ সকল মুসলমানদের জন্য

গত ১৫ই এপ্রিল আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের সংসদ এবং পশ্চিমী দেশগুলির দূতাবাসের উপর একযোগে তালিবানী হামলায় অনেক হতাহত হয়েছে এবং আমেরিকার গোয়েন্দা দপ্তরের ব্যর্থতা ফুটে উঠেছে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমেরিকা পাকিস্তানকে প্রচুর টাকা দিচ্ছে। সেই টাকায় কেনা অস্ত্রশস্ত্র চলে যাচ্ছে তালিবানের হাতে—এই কটু সত্যটি আজ সকলের সামনেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই হামলার দুদিন পরই তালিবানেরা মুসলিম দুনিয়ার কাছে সাহায্য চেয়ে আবেদন জানিয়েছে তাদের জেহাদ চালু রাখার জন্য।

তালিবানেরা তাদের ওয়েবসাইটে দেওয়া এই আবেদনে তাদের টেলিফোন হট লাইন নম্বর এবং ইমেলের ঠিকানাও দিয়ে দিয়েছে। এতে তারা তাদের উপর অমুসলমান আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে জেহাদরত যুবকদেরকে সাহায্য করার জন্য সারা বিশ্বের মুসলমানদের কাছে আবেদন করেছে। এই জঙ্গীরা বলেছে, ইসলামী শরিয়ত অনুসারে সকল স্থানের সমস্ত মুসলমানদের জন্যই অর্থ ও আত্মা দিয়ে জেহাদে অংশগ্রহণ করা কর্তব্য। তালিবান একলা জেহাদের যুদ্ধ করছে। তাই ইসলামে বিশ্বাসী প্রত্যেককে আন্তরিক ভাবে তাতে সাহায্য করতে হবে।

(সূত্র ঃ দৈনিক জাগরণ, ২০-৪-১২)

হিন্দু সংহতির দ্বিতীয় মহিলা সম্মেলন

হিন্দুর ধর্ম সম্মান ও মাটি রক্ষার সংকল্প নিয়ে ২০০৮ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী 'হিন্দু সংহতি'র যাত্রা শুরু হয়েছে। এই চারবছরের মধ্যেই বহু অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছে এই সংগঠনকে। দিতে হয়েছে বহু মূল্য। হিন্দু ভাইদের সঙ্গে বোনেরাও এই কাজে সমানভাবে এগিয়ে এসেছেন। দেবশক্তি যখন কঠিন সংকটে তখনই দেবীশক্তির আবির্ভাব। সেই দেবীশক্তিকে আহ্বানের জন্যই আয়োজন করা হয়েছে হিন্দু সংহতির দ্বিতীয় মহিলা সম্মেলন।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীমতী মুমু দে তালুকদার, সদস্যা, প্রবিণী ফাউন্ডেশন, আমেরিকা।

সম্মেলনের স্থান ও তারিখ ঃ ভারত সভা হল, বৌবাজার, কলকাতা (মেট্রো রেলের সেন্ট্রাল স্টেশনের পাশে) ২২শে জুন ২০১২ শুক্রবার, সময় ঃ বেলা ২টা।

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি <www.hindusamhati.org>, <www.hindusamhatitv.blogspot.com>, <southbengalherald.blogspot.com>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006,
Published at : 303/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Pargans,
Editor's Name & Address : Prokash Chandra Das, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012